ছোটোদের গল্প বার্ষিকী

ঝালাপালা

১৪২৮

সম্পাদক

অশোককুমার মিত্র

প্রচ্ছদ

প্রদীপকুমার ভট্টাচার্য

অলংকরণ

যুধাজিৎ সেনগুপ্ত, শমীন্দ্র ভৌমিক, শংকর বসাক

ঝালা
পালা

গত বছরের ঝালাপালা প্রকাশের দুঃসময়-স্মৃতি জেগে উঠছে এবারের কথা লেখবার প্রতিটি মুহূর্তে। করোনা নামক অতিমারীর আকস্মিক প্রাদুর্ভাবে বিশ্বজোড়া সমাজ জীবনে যে সংকট উপস্থিত, তার আঘাত শতবর্ষ পূর্বের 'স্প্যানিশ ফ্লু'-র কথা অনেকের মনে পড়েছিল—অবশ্য সে রোগের প্রভাব সারা বিশ্বময় এভাবে ছড়ায়নি—শুধু আমাদের ভারতবর্ষ কেন, জাপান ব্যতীত এশিয়া মহাদেশের অনেক দেশেই সে ভয়ানক রোগের করাল ছায়াপাত ঘটেনি। এবারে এই করাল-থাবা থেকে রক্ষা পেয়েছে কোন কোন দেশ তার পূর্ণ বিশ্লেষণ এখনও হয়নি, তবে একথা বলা যেতে পারে তেমন সৌভাগ্যবান দেশের সংখ্যা ভূ-ত্বকে খুব বেশি হবে না। আর এই রোগ আমাদের দেশকে মৈত্রীর শৃঙ্খলে বেঁধে দিয়েছে। দ্রুত প্রতিষেধক টিকা আবিষ্কার এবং তার উৎপাদন ও প্রয়োগ বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আর সুরক্ষার জন্য নাগরিকদের মধ্যে দায়িত্বশীলতাও বাড়ছে—ফলে প্রত্যাশা করা যায় তৃতীয় ঢেউ-এর প্রবণতা আমাদের উদ্ভাবিত প্রতিরোধ ক্ষমতাতেই প্রশমিত করা যাবে। করোনার আক্রমণে এক বছরে আমরা ঝালাপালার ঘনিষ্ঠ বেশ কিছু লেখক ও বন্ধুকে হারিয়েছি—তাঁদের স্মৃতির প্রতি আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

এই শঙ্কার ভেতরেই আসছে আমাদের জাতীয় জীবনের পরম আনন্দময় মুহূর্ত—দীর্ঘ পরাধীনতার শিকল-ছেঁড়া স্বাধীনতার প্ল্যাটিনাম জুবিলির দ্বার-প্রান্তে আমরা উপস্থিত হয়েছি। পরম শ্রদ্ধায়, পরম নিষ্ঠায়, পরম উদ্দীপনায় আমরা এ দিনটি উদ্‌যাপনে স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও সম্প্রীতির শপথ গ্রহণ করব। শতসহস্র শহীদের আত্মবলিদানের মূল্যে পাওয়া স্বাধীনতা কোনো কারণেই সৌভ্রাতৃত্বের অমর্যাদা করে কালিমালিপ্ত করতে পারব না। এ বছর শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সার্ধশতবর্ষ ও সত্যজিৎ রায়ের জন্ম-শতবর্ষ। অল্পকাল আগে সাহিত্যিক সন্তোষকুমার ঘোষের জন্মশতবর্ষ পেরিয়ে এসেছি। স্মরণে-শ্রদ্ধায় তাঁদের একটি করে গল্প এ সংখ্যায় প্রকাশ করা হল। সত্যজিৎ রায় ও সন্তোষকুমার ঘোষের গল্প পুনর্মুদ্রণে অনুমতি দেবার জন্য আমরা সন্দীপ রায় ও কাকলি চক্রবর্তীর কাছে কৃতজ্ঞ।

তাছাড়া রইল প্রতিষ্ঠিত এবং প্রতিষ্ঠা-অর্জনের পথে পা বাড়ানো আমাদের বন্ধু প্রিয় সাহিত্যিকদের নানা জাতের, নানা জাতের, নানা স্বাদের গল্পগুচ্ছ।

করোনার প্রতিকূলতায় ছোটোদের ইস্কুলের কপাট বন্ধ, কোথাও কোথাও অনলাইন ক্লাশ চলছে। বান্ধবহীন তাদের মনে খুশির আমেজ ফোটাতে এখন বৃষ্টি-ধোওয়া নীল আকাশ, পদ্ম দীঘির কমল বন, বুকে ধানের ছড়া নিয়ে শ্যামল খেত আর কাশবনের হাওয়ার দোলায় খুশি খুশি গন্ধ। সেই খুশির হাটে ঝালাপালা বার্ষিকীর হাজিরা তোমাদের খুশি আরও বাড়াবে—এই প্রত্যাশা।

তোমরা আমাদের আদর নিও।

ঝালা
পালা

মহালয়া, ১৪২৮
কলকাতা-১০৬

সূচিপত্র

হারানো দিন চির নবীন

বাদশাহি গল্প	অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫
টুবলুর কান্না	সন্তোষকুমার ঘোষ	৮
নিধিরামের ইচ্ছাপূরণ	সত্যজিৎ রায়	১০

গল্প

ছিল, আছে, থাকবে	অভিজিৎ সেনগুপ্ত	১৩
চিড়িয়াখানা	সুনীল জানা	১৭
জেল খাটাবার ফন্দি	শেখর বসু	১৯
রাজা উদ্‌ভটেশ্বর	বলরাম বসাক	২৩
ভূত বলে তো কিছু নেই	অমর মিত্র	২৬
বিলেত ফেরত দাঁতের ডাক্তার	শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়	২৯
স্বাধীনতার শেষ যুদ্ধ	স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৩
করোনার কালবেলায় জন্মদিন	সনৎকুমার মিত্র	৩৮

বিচিত্র এই পৃথিবীতে

কত অজানারে	জ্যোতির্ময় দাশ	৪০
মিলিটারি বুটের শব্দ	তপন বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৩
দিওয়ানগঞ্জের স্টেশনমাস্টার	দীপান্বিতা রায়	৪৮
দুঃস্বপ্নের একটি দিন	আবীর গুপ্ত	৫৩
মাইগ্রেন	গৌর বৈরাগী	৫৮
নাবিক	অভিজিৎ চৌধুরী	৬১
সুন্দরী	হেমেন্দুশেখর জানা	৬৪
বাসা	ছন্দা চট্টোপাধ্যায়	৬৭
বিরিঞ্চিবাবা	দীপ মুখোপাধ্যায়	৭০
রেফারির বাঁশি	সমর মিত্র	৭৩
নীলকর সাহেবের হাসি	পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়	৭৭
এক সকালের গল্প	চন্দন নাথ	৮১
রাজা হওয়া	কাবেরী চক্রবর্তী	৮৫
একটা সোনালি স্বপ্নের গল্প	দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য	৮৯
সর্পকাণ্ড শিলংয়ে	শিশির বিশ্বাস	৯৩
তাহলে	যুধাজিৎ সেনগুপ্ত	৯৭
কাল নতুন দিন	জয়দীপ চক্রবর্তী	১০১
নীল ফাইল	শুভমানস ঘোষ	১০৫
আলতা নদীর পারে	শাশ্বতী নন্দী	১০৮
হয়তো কোনো একদিন	অভিজিৎ রায়	১১২
ইমলির প্রথম গোয়েন্দাগিরি	তনুজা চক্রবর্তী	১১৫
সূর্য	শোভন শেঠ	১১৯
শেষ খেলা	অনন্যা দাশ	১২২
বিনুর কীর্তি	গৌতম হাজরা	১২৬
আলো আমার আলো...	সুস্মেলী দত্ত	১২৮
সুগন্ধী ইরেজার	রতনতনু ঘাটী	১৩১
টিং টিং	উৎপল চক্রবর্তী	১৩৩
রাস্তার ভূত	মনজিৎ গাইন	১৩৭
অরণ্যের স্বপ্ন	অবশেষ দাস	১৪১
একটা ভালো কাজ	মৃত্যুঞ্জয় দেবনাথ	১৪৪
লাটাগুড়ির জঙ্গলে নাড়ুমামা!	চন্দন চক্রবর্তী	১৪৭
তেরো তারিখ শুক্রবার	শুভায়ন বসু	১৫০
রোবট-মানুষ	কৌশিক ঘোষ	১৫৪
সেই অসমাপ্ত গল্পটি	দেবাশিস সেন	১৫৬

বাদশাহি গল্প

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাদোশাবাবু বললেন—দাদামশা, ভূতপত্রীর দেশ দেখা শেষ করে কোথায় গেলে?

—গেলেম একটা জায়গায়।

—কীসে গেলে? পালকিতে?

—না।

—রেলগাড়িতে?

—না।

—পায়ে হেঁটে?

—না।

—ইস্টিমারে? মটোরে? উড়োজাহাজে?

—না।

—তবে?

—শোন বলি—

—জলপথ স্থলপথ আকাশপথ এই তো তিনটা
জলেতে চলি সাঁতার কাটি, থলেতে চলি ধরে লাঠি
আকাশ পথে স্বপ্নে হাঁটি
তবু ছাড়ে না বিপদ আপদ
সঙ্গে লেগে আছেই কোথাও একটা যাবার চিন্তা।
কোথা যাই, কীসে যাই এই ভাবচি সারা দিনটা।

—একটা কাঠের ঘোড়া কিনে বেরিয়ে পড়লে না কেন দাদামশা, কিম্বা মশার পিঠে চড়ে?

—গিয়েছিলেম মশার পিঠে চাপতে, সেটা বললে—

তোমার এই গজগিরি দেহ গুরুভার
সাধ্য নেই বহা ক্ষুদ্র মশার
কিম্বা যুদ্ধ ঘোড়ার
জল পী পী কাঠের ঘোড়া তো কোন ছার!

গেলেম আলিপুরের চিড়িয়াখানায়—সেখানে উটপাখিকে বললেম, আমাকে একবার ঘুরিয়ে আনতে পার? সে বললে—রোজ তিন মণ করে লোহার পিরেক যদি খাওয়াতে পার তো রাজি আছি। সোনার সঙ্গে সমান দরে বিকোচ্ছে বাজারে লোহা জেনে উটপাখির আশা ছাড়লেম। উট বললে—যদি আলুকাবলি খাওয়াতে পার সাড় বত্রিশ সের করে দু-বেলা তো এস, নয়তো যাও। বলে, ডাঙ্গার জাহাজ সে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল! বন-মানুষটা নীচের ঠোঁট উলটিয়ে আমায় ভেংচে দিল। হাতি গজ-দাঁত বার করে হেলে দুলে হাসতে থাকল—নীরব হাসি।

জানোয়ারদের খোশামোদ করতে ঘেন্না ধরল; তখন মনের দুঃখে ঘরে এসে নিজের চৌকিতে একটু জিরোতে বসলেম ছারপোকার ভয়ে পুরোনো আসনখানা পেতে।

—এইবার বুঝেছি, দাদামশা ছারপোকার পিঠে চড়ে চললে।

—ঠিক বলেছ বাদোশাবাবু, এতক্ষণে ঠিক ধরেছ। বার হলেম ছারপোকার পিঠে, —'আসুন, বসুন' লেখা আসন পেতে।

—তখন কী হল?

এই মনে হচ্ছে ভাসছি জলে এই বোধ হচ্ছে যাচ্ছি থলে, গ্রাম হতে গ্রামান্তরে! পরেই মনে হচ্ছে, গোরু গাধা ছাগল ভেড়া হাঁস মুরগি তাদের সঙ্গে চরছি আবার উড়ছি এক স্তরে—বন হতে বনান্তরে, দিক হতে দিগন্তরে। পথের পন্থি এমনই বোধ করছি যেন, হয়ে গেছি পক্ষী। মাছ-রাঙা হয়ে মাছ গিলছি—হঠাৎ কাঁটা বেধেছে। অমনি 'অবাক' বলে আসন ফেলে দিয়েছি এক লাফ।

—এ রে, দাদামশায়কে ছারপোকা কামড়িয়েছে।

—আরে না ভাই না, হাসি না। শোনো না বলি। জেগে দেখি অন্ধকারে ভুবনেশ্বরের মাঠে চকাচোঁও লেগে দাঁড়িয়ে গেছি!

চেয়ে দেখছি—
আঁধার পরে চাঁদের কলা,
কতক কালো কতক ধলা
উত্তরে উঁচা দক্ষিণে কাত
মেঘ একখানা বিরাট
কোন দেশ হতে আসছে, কোথায় যাচ্ছে
কিছু যায় না বলা!
গুম্ভি ঘর একটা তারি তলায়
তেল কালি পড়া পুরোনো বেজায়
সেটার চূড়ায় পেটা লোহার ভূশণ্ডি কাক।
দু-মুখো তার দুটো গলা।

—গুম্ভি ঘর কারে বলে দাদামশায়?

—কে জানে ভাই, দেখে মনে হল সেটা গুম্ভিঘর।

কে জানে ভূতখানা কী গুম্ভিঘর
ধাঁচাখানা খাঁচাপানা
কোন লুপ্ত যুগের গুপ্ত কৃষ্টির দিচ্ছে খবর
বারান্দা দিচ্ছে গান্ধার শিল্পের গন্ধ
মৌর্য শিল্পের শৌর্য্য বোঝাচ্ছে

সারি সারি দরজা জানালা আঁট সাঁট বন্ধ
অলিন্দে বারেন্দ্র শিল্পের খাড়া কটা কবন্ধ
মাথার জন্যে অপেক্ষা করছে একটানা
সদর দোরে পাল রাজাদের পালকি
আছে পড়ে একখানা।
কোথা এলেম কিছু ঠিক নাই
মনে ভাবছি আগাই না পিছাই

এমন সময় নাক-কাটা দুই মূর্তি হাজির। খোনা খোনা নাকি সুরে বললে—এই যে অবুবাবু নমস্কার। কেমন আছেন? বলেই দুজনে গীত ধরলেন—

ভালো আছেন তো, ভালো আছেন তো?
দেখছি কাহিল নিতান্ত
মন প্রাণ তো আছে শান্ত?
চিনতে পারছেন ত?
উপদেব উপাধ্যায়, প্রভূত সামন্ত
ভূতখানার কিউরেটার ও তাঁর অশিষ্টান্ত।

দেখি একটা কিছু জবাব না দিলে অশিষ্টতা হয়; বললেম—ভালো আর কী, যেতে যেতে রয়ে গেছি। প্রায় হয়েছে প্রাণান্ত; কই মশায়দের স্মরণ হয় না তো!

কী আশ্চর্য! কত্তকালের ফ্রেনশিপ। একদম মেমারি স্লিপ। আমরা কিন্তু ধরেছি ঠিক আপনি অবুনিবাবু না হয়ে যান না। শিল্পীপ্রাণ শিল্পীপ্রোদান শিল্পাচার্য আমরা আপনার—বলেই দুই প্রভূতে আমরা দুই হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল।

আমি ভাবচি—যাচ্ছি কী যাচ্ছি না। তারা বলছে—চলেন চলেন, দেখবেন চলেন আমাদের ভূতখানার অদ্ভুত কলেকশানটা!

প্রভূত বললেন—ভূতখানাটি ভুলেশ্বর পরগণার—ভূভারতের অধুনালুপ্ত কৃষ্টির রত্ন সমষ্টির—বললেও চলে—একটি বিশেষ রত্নভাণ্ডার।

উপদেব বললেন—এখান থেকে দেখেন ধাঁচা খানা বাড়িটার—সত্যি বললেন, কেমন লাগচে আপনার?

আমি আর কী বলি, মুখে এল—ভূতগত-ব্যাপার, সামনে বললেম—চমৎকার।

চৌকোস যেন লখিন্দরের মাঞ্জাসটা লোহার
গম্বুজটি যেন মাহেঞ্জোদাঁড়োর তিজেল হাঁড়ি
তোরণ মকরটি যেন পোড়া মৎস্যটি নল রাজার।

—বলেন তো পরিকল্পনাটি কার সারা বাড়িখানার। দেখি ভাস্কর্য সম্বন্ধে ভূয়োদর্শন কতদূর এগিয়েছে আপনার? আমি তখন ভূয়োদর্শন করব কি, চক্ষে অন্ধকার দেখছি। একবার মনে হল বলে ফেলি—ধীমান বীটপালং-এর। কিন্তু কী জানি কপাল ঠুকে বললেম—শ্যাম মিস্তিরির—কাম্বোডিয়ার।

উপদেব একটুখানি হেসে বললেন, নিজের বুকে আঙুল ঠেকিয়ে—আমার।

প্রভুত বলে চললেন—ভিতরটা দেখেন একবার।

খট্ করে একটা তালা খোলার শব্দ হল—কালচিটে নিবিড়ান্ধকার ভেদ করে ভিতরে ঢুকে দেখি ফিকে ফিকে তিমির সঞ্চার। ডাইনে বাঁয়ে ভূতখানার দুই মহাপ্রভুতে লিস্টি ধরে দেখিয়ে চললেন, আমিও দেখে চললেম।

—শেষু নাগবংশীদের সিন্ ভারলাগ ওস্টাইরিন হতে সংগ্রহ করা।

—কালিদাসের ঘোঁটনকালির এক টুকরো।

আমি বললেম—

বর্ণচ্ছটায় কোককে হারায়, কোথায় পেলেন এটি?
—নিউকাস্‌ল পাঁচ নম্বর জেটি
কয়লার দরে পাওয়া গেছে এ রত্নটি।
—দেখেন সগরাশ্বমেধের ঘোড়ার আক্কেল দাঁত
সিলোনে পাওয়া মাটির তলায় পাঁচ হাত!
আমি বললেম—এই কী যেন গুলোপোড়া শিতলপাটি?
—আজ্ঞে না, ওটি বেহুলার মেখুলাসাটি।
—ওটা কি শাঁখ ভাঙা নাকি?
—লখিন্দরের মালাই চাকি।
—কী একটা গজালের মতন?
—লোহদন্ত মুনির দাঁতন।
—এটা বুঝি কাগজের পালক?

—আজ্ঞে না, আলেকজান্ডারের বিউকিফেলার ঘোড়ার চক্ষের পালক।

—এটি কাঁচপোকার ডানা না?
—আহা দেখে পায় কান্না—লক্ষণ সেনের সানকি ভাঙা।
—এটা যে দেখি ভাঙা বোতল।
—আরে না মশায়? সম্রাট অশোকের গড়গড়ার মুখনল।
—ও যে পড়ল একটা কাগজের চিরকুট।

—আহাঃ উপগুপ্তের প্রেমপত্রের কোনো এক্‌টুকু করকোষ্ঠী ভাষায় লেখা। শুঙে দেখলে লোধ্ররেণু গন্ধ পাবেন অত্যল্প খুব।

—দেখেন অজন্টা গুহার দোরের ছিটকিন।
যেন আজকালের একটি চেপ্টিপিন।
পাহাড়পুরের কাঁচা ইট একখান।
মাহেঞ্জোদাড়োর বেঞ্জোর কান
—এটা বুঝি নারদ মুনির পিয়ানোর তার?
—অদ্ভুত শিল্প-দৃষ্টি আপনার।
—লম্বা আঙুল দেখেই বুঝেছি।
—বাইরে পড়ে ওটা কী?
—মৈপাল রাজার সুখপাল পালকি।
—তাহলে আমি ওটাতেই উঠি আর কি—নমস্কার।
—বড়োই চললেন তাড়াতাড়ি।
দেখা হল না চাঁদ সাগরের হেঁতাল বাড়ি।
নেতা ধোপানির পাট, বড়ু চণ্ডিদাসের দোয়াদ
বাংলার কৃষ্টি সব গেল বাদ—
দেখলে হত কাজ ভারি।
আমি বললেম—পরে আসব যদি সময় করতে পারি।
—যেরূপ দিনকাল পড়েছে মশয়—
দেখেন বল্লাল সেনের ব্রাহ্মণ ভোজনের
খুরি গেলাস মেটে হাঁড়ি।
—তাহলে যাই এখন, সুখপালে হই কাত?
—প্রণিপাত, দণ্ডবৎ—একটু দিয়ে যান অটোগ্রাফ।

পকেট খুঁজতে গিয়ে দেখি পকেটও নেই, সোয়ান কলমও নেই, কামিজটাও লোপাট।

জেগে দেখি হয়ে গেছি ঠাকুর শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ।

টুবলুর কান্না

সন্তোষকুমার ঘোষ

বাবা, তুমি পেগেসাস্ বলে কোনো কথা জানো?

টুবলু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল। বাবা তখন খুব জরুরি একটা নথির মধ্যে ডুবে আছেন, জবাব দিলেন না।

টুবলু আর একটু কাছে এগিয়ে গেল। জিজ্ঞেস করল আবার। এমনিতেই বাবা রাশভারী। আজকাল আবার লম্বা গোঁফ রেখেছেন বলে সর্বদাই ওঁকে কেমন রাগী-রাগী লাগে।

বাবা এখন মুখ তুলেছেন। প্রথমে তাকালেন টুবলুর দিকে। পরে সেই চোখই ওদের ইস্কুলের গ্লোবটা যেরকম ঘুরে যায়, সেইরকম ঘুরে ভিতরের দিকে গেল। যে দিকে অন্দরমহল। তার চেয়েও বড়ো কথা, যেদিকে মা। টুবলুর মা।

গলা খাঁকারি দিয়ে আওয়াজটাকে মেঘের মতো করে (মেঘনাদ বলে কে একজন রামায়ণে ছিল না?) হাঁক ছাড়লেন, কই, এদিকে এসো।

টুবলু তখনও উবু হয়ে বসে। বাবা পেগেসাস কথাটা শুনেছে কিনা, সেটা তার এখনও জানা হয়নি।

কই, কোথায় তুমি? বাবা হাঁক পাড়লেন। তারপর গোঁফ জোড়াকে একবার মুচড়ে বললেন, পেগেসাস? জানি বই কি! ও তো একটা পক্ষীরাজ ঘোড়া।

—পক্ষীরাজ ঘোড়া মানে যে-ঘোড়া ওড়ে, তাই না বাবা? টুবলু একটু সাহস পেয়ে জিজ্ঞেস করল। আগেকার দিনে ঘোড়াও উড়ত, তাই না?

বাবা বললেন, 'হুম'।

টুবলু বলল, 'আজকাল সেই হিসেবে বড্ড বিচ্ছিরি। শুধু গাছ থেকে যে-সব পাতা খসে পড়ল, তারা ওড়ে, পাখিরা ওড়ে, আর পাখিদের দেখাদেখি প্লেনও ওড়ে। মেঘও ওড়ে বলা যেত, তবে আমার কী মনে হয় জানো, মেঘ ঠিক ওড়ে না, ভেসে যায়।'

বাবা আবার বললেন, 'হুম'।

ততক্ষণে মা আঁচলে হাত মুছতে মুছতে সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন।

—ডাকছ কেন? মার গলা বরাবরের মতোই খুব নরম। শব্দ যদি কবুতরের বুক হত তবে তার আওয়াজও বোধ হয় এমনই তিরতির করত। আর শব্দ যদি পুকুর হত? টুবলু এত-শত ভাবতে পারছে না। সব হত থিরিথিরি, যেন একটু কাঁপা কাঁপা।

টুবলু এত-শত ভাবতে পারছে না এইজন্যে যে, বাবা এখন মাকে বকছেন। টুবলু শুনতে পাচ্ছে, বাবা বলছেন, মেয়েটাকে ভুলভাল যা-তা কী সব শেখাচ্ছ বলো তো? ঘোড়া ওড়ে?

—এত চটছ কেন? শোনোনি, এক সময় পাহাড়দেরও ডানা

ছিল, তারা উড়ত। এমনকি এই যে পৃথিবীর সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, সবাই ঘোরে তার মানে ওড়ে, তাই না?

—বাজে কথা বন্ধ করো। বাবা ঝামড়ে উঠলেন। তুমি একটা না দুটো ডিগ্রি পেয়েছ বলে ধরাকে সরা জ্ঞান করো, তাই না?

—কই করি না তো! মা আস্তে উত্তর দিলেন।

—করোই না যদি, তবে আমি ডাক দেবার পরেও এত দেরিতে এলে কেন? (টুবলুর মনে হল বাবা এবার সত্যিই মেঘনাদ হয়েছেন।)

—কোথায় দেরি? বড়ো জোর দু-মিনিট কী চার-মিনিট। আজ যে পুপলুর খুব জ্বর।

পুপলু মানে টুবলুর ছোটো ভাই। দেড় বছর কি দু'বছর বয়স হবে। কিন্তু টুবলু আশ্চর্য হয়ে গেল, বাবা পুপলুর যে জ্বর, সে কথাটা যেন গায়েই মাখলেন না, কানেই তুললেন না। তখনও তিনি গমগমে গলায় বলে চলেছেন, যা দ্যাখোনি তো কক্কনো বাচ্চাদের শেখাবে না।

—শেখালে কী হবে?

—ওরা ভুল শিখবে।

—আমরা যা দেখিনি তার সবই কি ভুল? দূরে যাব না। হাওয়া দেখতে পাচ্ছি না, সেই হাওয়াটা কি ভুল? যা না-দেখা জিনিস, তাকে ভাবা সে-ও খুব বড়ো ব্যাপার, তুমি আজ রাগের মাথায় বুঝতে পারছ না। ওই ভাবতে পারা আমাদের একটু বাইরে নিয়ে যায়। এই বাড়ির, এই শহরের।

—তবে তো তোমার মেয়ে টুবলু একদিন মৎস্যকন্যাও হতে চাইবে। তারা কি কোথাও আছে? দ্যাখো, লজিক তুমিও পড়েছ, আমিও পড়েছি। আমার কথার একটা লজিকাল জবাব দাও।

—মৎস্যকন্যারা আছে মানুষের মনে। মেয়ে তা হলে হ্যান্স অ্যান্ডারসেন বা অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড—এসবও পড়বে না?

মা আরও বলল, —পড়বে বই কি, (বজ্রগম্ভীর গলা) কিন্তু বিশ্বাস করবে না। মনে রেখো, বেঁচে থাকাটা মোটের ওপর যা কিছু প্রামাণ্য তারই উপর টিকে আছে। টুবলু এসব কথা শুনতে পেল।

টুবলু এই প্রথম তার মাকে গাঢ় জোরালো গলায় কোনো কথা বলতে শুনল।

তিনি চলে যাচ্ছিলেন। বাবা আঁচল ধরে ঠেকালেন মাকে বললেন, যাচ্ছ, তবে আমার কথাটাও শুনে যাও। অলীক, অসম্ভব ব্যাপার-স্যাপার বাচ্চাদের বেশি শেখাতে নেই। তাতে ওরা কল্পনা করতে শিখতে পারে, কিন্তু বাস্তব জীবন এই যে রোজ লড়াই করে বেঁচে থাকা—এর সঙ্গে নিজেকে মেলাতে পারে না। খাবার পাতে কচুশাক দেখলে হয়তো-বা বলে ওঠে পদ্ম কই? আমি তাই ওই পক্ষীরাজ আর মৎস্যকন্যাদের ব্যাপারে তুমি যা বলেছ, তুমি মেয়েটাকে যা শিখিয়ে চলেছ, তা একদম পছন্দ করতে পারছি না। যা দেখা যায়, যা ছোঁয়া যায়, আসলে সেইটাই জীবন। সেইটাই বাস্তব। আমি আর কিছুতে বিশ্বাস করি না। করি না, করি না, করি না।

আঁচল ছাড়িয়ে মা চলে যাচ্ছিলেন, তখন যেন বাবার হুঁশ হল। আঁকা ছবির মতো টুবলু সব দেখছিল। বাবা বললেন, পুপলুর কী হয়েছে বলছিলে যেন?

—শুনে তোমার কী হবে? তুমি তো কানেই নাও না। সকালে দেখেছিলাম গা গরম, তুমি তো তোমার নথি-পত্তরে ডুবে আছ, তোমাকে বলিনি। পরে থার্মোমিটার দিয়ে দেখি একশো এক। এক ঘণ্টা পরে একশো তিন। এখন বোধ হয় একশো চার।

টুবলু বাবাকে চিৎকার করে উঠতে শুনল। ডাক্তার ডাকোনি?

মা খুব ময়লা হেসে বললেন, আবার বলছি, শুনে তোমার কী হবে? তোমার নথিপত্তর? সেগুলোর কী হবে? সেগুলো তো খুব বাস্তব? ওদের ধরা যায়, ছোঁয়া যায়, পড়া যায়। ডাক্তার এসেছিলেন। ওষুধ দিয়েছেন। তবু জ্বর বাড়ছে। বলেছেন, বোধ হয় ম্যালিগন্যান্ট কোনো ইনফেকশন। ওগো, একশো চার যদি একশো পাঁচ হয়, একশো পাঁচ যদি গিয়ে ঠেকে সাত কিংবা আটে, তখন কী হবে।

বাবা তাঁর হেলানো চেয়ারে এলিয়ে পড়েছেন, টুবলু দেখল। শুনল সেই মেঘ মেঘ গলা নেই। বাবা ভাঙা গলায় বলছেন, পুপলুটা তবে কি বাঁচবে না? আমার একমাত্র ছেলে—

কথাটা বাবা শেষ করতে পারেননি, তার আগেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেছেন মা।

মার পিছে পিছে টুবলুও যাবে, হঠাৎ হাওয়ায় কাঁপা পর্দাটার আড়ালে দাঁড়াল। হেলান চেয়ারে এলানো বাবা উঠে দাঁড়ালেন। ওই যে তিনি চেয়ারটা ছেড়ে উঠেও দাঁড়ালেন। হাঁটু গেড়ে বসলেন মেঝের উপরে। ঠিক সামনের দেওয়ালেই মহাকালীর একটি ছবি। মা যেন কোন মন্দির থেকে কিনে নিয়ে এসেছিলেন।

টুবলু দেখল, বাবা দেওয়ালে ক্রমাগত মাথা ঠুকছেন আর বিড়বিড় করে কী যেন বলছেন। সে কি প্রার্থনা, সে কি মন্ত্র?

বাবার চোখে চিক্‌চিক্ জলও দেখতে পেল টুবলু। জল এল তার নিজেরও চোখে। তার একমাত্র ভাইটি নাও বাঁচতে পারে এই ভয়ে? হয়তো তাই, হয়তো সবটা তাও নয়। এই একটু আগে বাবা বলেছিলেন না, যা দেখা-ছোঁওয়ার বাইরে তা তিনি বিশ্বাস করেন না? ধমকেছিলেন টুবলুকে, টুবলুর মাকে। কোথায় গেল সেই ধমক? অদ্ভুত একটা বিশ্বাস টুবলু যা আগে দেখেনি, টুবলু যা বুঝেছে বা বুঝছে না, এমন একটা শক্ত মানুষের বিশ্বাস চোখের জল হয়ে সব ভাসিয়ে দিচ্ছিল। যার প্রমাণ নেই বাবার তাতে বিশ্বাসও নেই, এই তো খানিক আগে জোরে জোরে চেঁচিয়ে এই ধরনের কী যেন কথা বলেছিলেন তিনি।

টুবলু কাঁদছিল। ভাইটি নাও থাকতে পারে এইজন্যে তো বটেই, কিন্তু তার চেয়েও ভীষণ একটা কাঁটা তার বুকে বিঁধছিল।

টুবলু বোকার মতো বিশ্বাস করে। তবু সে তার হঠাৎ-বিশ্বাসী বাবাকে জীবনে তো আর বিশ্বাস করতে পারবে না। তার ভাই যাবে কি না যাবে, সেটা পরের কথা। তবে এটা ঠিক যে, তার বাবা গেল। টুবলু কাঁদছিল ভেঙে-পড়া বাবাকে হারানোর দুঃখে। দুঃখে? কে জানে? একটা সুখেও তো হতে পারে।